গজেন্দ্রকুমার মিত্র—এক ব্যতিক্রমী কথাশিল্পী

(১৯০৮ - ১৯৯৪)

তারকনাথ লাহিড়ী

শতবর্ষে ঠিক নয়, ১০১ বছরে তাঁকে নিয়ে বসেছি। বসেছি এই কারণেই— কথাশিল্পে তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের শহর বা গ্রামের বনেদী পরিবার বা ঐতিহাসিক নক্ষত্রদের নিয়ে লেখেননি, বা শরৎচন্দ্রের পল্লীসমাজের আবেগধর্মী বা বুদ্ধিজীবি রোম্যান্টিক প্রেম জমাননি, রবীন্দ্রনাথের বৌদ্ধিক গোষ্ঠীর রোম্যান্টিক মনস্তত্ত্বে যাননি— অথচ এই তিনজনেরই তিনি ভক্ত ছিলেন। তাঁর সময়ের সিনিয়র তিন নক্ষত্র— তিন বাঁড়ুজ্যের গ্রামবাংলার সমাজ বা তাঁদের ফোকাস যেদিকে-সেদিকে তিনি নেই। অর্থাৎ বিভূতিভূষণের প্রকৃতিসম্পৃক্ত গ্রামীণ সামাজিক চিত্র, তারারশঙ্করের আউলি - বাউলি গ্রাম বা গ্রামের কোঁদলি প্রবাহ, অথবা মানিকের শহরতলী বা গ্রামবাংলার নীচুতলার মানুষদের জীবনসংগ্রাম ও জৈবজীবন। সমবয়সী সুবোধ ঘোষের ক্ল্যাসিকধর্মীতাও তাঁর 'পাঞ্চজন্য' জাতীয় কয়েকটি শেষ দিকের উপন্যাস ছাড়া তাঁর গল্প-উপন্যাসে অনুপস্থিত। নির্যাসে বলতে গেলে বলতে হয় তিনি এক রোম্যান্টিক নিটোল বস্তুনিষ্ঠ কথাকারই নয়, কথাশিল্পীই। শিল্পী এইজন্যেই—নিরেট বাস্তব বুনুনিকে মনোজ্ঞ করার নিপুণ শিল্পদক্ষতা তাঁর ছিল— সেইগুণেই তিনি ব্যতিক্রমী। তাঁর কাহিনী বেগবান নয়—দৈনন্দিন রোজনামচার নানা ঘটানাক্রম দুলকিচালে এগিয়ে চলে— সুদীর্ঘ বহুচরিত্র সমন্বিত—বিস্তারিত, অথচ একফোঁটা ক্লান্তিকর নয় এবং লম্বা হলেও কোথাও ঝুলে যায়না। আর তাঁর ক্ষেত্র ও চরিত্ররা হলো মুখ্যত নগর বা শহর নয়, উপকন্ঠের —যা শহরও নয়, আবার গ্রামও নয়। শহরের উপ াত্ত বা গঞ্জবাসী, এবং শহরের সঙ্গে তাদের জীবিকা ও জীবনযাপন জড়িত। সমাজের উপরতলার চরিত্ররা ফোড়ন হিসেবে আছে, ভিত্তির চরিত্ররা অধিকাংশই নিম্নমধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের একেবারে নীচেরতলার, যারা বাঁচার জন্যে লড়াই করতে করতে ওপরে ওঠার জন্যে খাবি খেতে খেতে কেবলই নীচে নামছে— নরকে ডুবছে। এত ঘুঁটিনাটি আর খুঁটিয়ে বলা— বা অত্যন্ত আটপৌরে বাচনিকতা আর সেই সংলাপ ও টুকরো টুকরো ঘটনাবলীর মধ্য দিয়ে পাঠককে একাত্ম করে নিয়ে চলা— এ যে কতোবড়ো মুন্সীয়ানার ব্যাপার তা গজেন্দ্রকুমারের গল্প - উপন্যাস না পড়লে বোঝা যাবেনা। বিশাল ক্যানভাস, বহু চরিত্র আর মন্দাক্রান্তাগতিতে চরিত্রগুলিকে কৈশোর থেকে প্রৌঢ়ত্বে নিয়ে চলা এবং তাদের বঙ্কিম - শরৎ - রবীন্দ্রনাথ বা বিভূতিভূষণ তারাশংকরের মতো ঘটনাসংঘাতে ক্লাইম্যাক্সে তোলা নয়, বা কেন্দ্রীয় চরিত্রগুলির সংঘাতের মধ্য দিয়ে শুদ্ধিকরণের বা সদর্থক উত্তরণের রিলিফ নেই— আছে এক স্বাভাবিক বিশ্বাস্য পরিণতি— অধঃপাতের বা কষ্টকরতার— যখন আমাদের মন বিষণ্ণ নয়, বিবশ হয়ে যায়, ওই অধঃপতনের জন্যে তাদের প্রতি ঘৃণা নয়, এক অজানিত সহমর্মী স্রোত ভেতরে বয়—যে রচনাশৈলী ও শিল্প গজেন্দ্রকুমারকে ব্যতিক্রমী কথাশিল্পীর শিরোপা পরিয়েছে। এরকমই একটা সামগ্রিক প্রোফাইল পাই গজেন্দ্রবাবুর উপন্যাস ত্রয়ীতে। সে তিনটি উপন্যাস হলো— 'কলকাতার কাছেই' উপকন্ঠে' ও 'পৌষ - ফাগুনের পালা'। কলকাতার উপকন্ঠের নিম্নমধ্যবিত্ত সমাজের নিম্নতম বিত্তের নাভিশ্বাস ওঠা জীবনসংগ্রামের এক অবক্ষয়ী কুরুবংশের জীবনলিপি। কেন্দ্রীয় চরিত্র শ্যামা ঠাকুরন। তার মা সচ্ছল সম্ভ্রান্ত পরিবারের রাসমণি দেবী ও তাঁর তিন কন্যা উমা, শ্যামা, কমলা—এই কন্যাদের বিয়ের পর তাদের স্বামীরা কাজ করে কলকাতায়, প্রথমে কলকাতায় আবাস পরে আন্দুলমৌরী অঞ্চলে। রাসমণির মৃত্যুর পর কলকাতার ভাড়াবাড়ি ছেড়ে উমা কমলাদের উপকন্ঠে পাড়ি। তাদের স্বামীদের শহুরে বদদোষ - নিষিদ্ধ পল্লীতে যাওয়া, পরিবারের দায় নিতে গাফিলতি— তাদের স্ত্রীদের ছেলেপিলে মানুষের দায় মেটাতে নানান উঞ্ছবৃত্তির আশ্রয় গ্রহণ— স্বামীদের স্বামীত্ব ফলানো নানাভাবে চলতে থাকে। মহিলারা সেসব অভ্যস্ত হয়ে ক্রমশ হৃদয়হীন হয়ে পড়ে। তাদের ছেলেমেয়েদের বিয়ে দেয়। সেই একই কাহিনী তাদের ক্ষেত্রেও। কেউ অকাল বিধবা হয়ে বাপের বাড়ি অর্থাৎ শ্যামার বাড়ি চলে আসে। মুখের চোপা থাকলেও শ্যামার মুখের কাছে টেকেনা। দেমাক নিয়ে বেরিয়ে ঐন্দ্রিলা রান্নার কাজ করে। শ্যামার ছোট মেয়ে তরু তার স্বামী আর এক রক্ষিতাকে নিয়ে থাকায়, মার কাছে চলে আসে। স্বামী হরেন সেই রক্ষিতাকে বিয়ে করে ঘরে তোলে। বাপের বাড়ির গলগ্রহ না থেকে সে স্বামীর ঘরে গিয়ে সতীনের চোপা শুনে একসঙ্গে থাকে এবং দুজনে স্বামীর দুপাশে শোয়। শ্যামার বড়ো মেয়ে মহাশ্বেতা মার বাড়ির কাছাকাছি পাড়ায় থাকে। সে আবার তার স্বামীর সব ভাইয়ের পরিবারে অর্থ সাহায্য বা তার মাকেও ঠেকায় বেঠেকায় সাহায্য ভাল চোখে দ্যাখেনা। স্বামী অভয়াপদও মালিককে ধোঁকা দিয়ে দুনম্বরী রোজগার করে। সে নিজে কায়ক্লেশে চলে— একান্নবর্তী পরিবারটা বাঁচুক যেন - তেন প্রকারেণ- তাই সে চায়। ভাই বা ভাইবউরা দাদাকে খাতির করে, মহাশ্বেতাকে পাত্তা দেয়না। অভয়পদ নাভিশ্বাস উঠিয়ে টাকা যোগালেও সংসারের কোনো ব্যাপারে নেই। তাই নিয়েও সমস্যা। ছেলেপেলেরা অমানুষ হয়। এভাবে ডালেপালে পরিবারটি ছড়াতেই থাকে এবং নানা জটে ডুবতে থাকে। নানা অনাচার, দুর্ব্যবহারে শ্যামা কেমন বোধহীন পাষাণ হয়ে যায়। শেষে সে আর কারও জন্য ভাবেনা। নিজের মহাজনী কারবারটাকেই সে যক্ষের মতো আঁকড়ে থাকে। শেষ দৃশ্যে শকুনের মতো সে পরিত্যক্ত বাড়িতে একা বসে টাকার ঘট উপুড় করে এক একটা করে টাকা গুণছে। ঐ ব্যাঙের আধুলিগুলিই তখন তার সন্তানসন্ততি। সমস্ত পুত্রকন্যা-নাতিনাতনি তার কাছে অস্তিত্বহীন।

তিনটি উপন্যাস একই কাহিনীর তিন পর্ব। কিন্তু প্রত্যেকটিই এত জীবন্ত ও বাস্তব সমাজচিত্র— যে সমাজের ছবি আগে কেউ তুলে ধরে নি, প্রথমটি— 'কলকাতার কাছেই' ১৯৫৭-তে বেরোলে সাহিত্য একাডেমী পেল। শেষ পর্বটি 'পৌষ - ফাগুনের পালা' ১৯৬৪-তে প্রকাশের পর রাজ্য সরকারের রবীন্দ্র পুরস্কার পেল। এই ট্রিলজি দিয়েই গজেন্দ্রকুমারের কথা সাহিত্যের আলাদা জাত ও মাদকতা চেনা যায়— যেখানে গেঁয়োমি, গেঁয়ো ভাষা দিয়ে মানুষগুলো তাদের দৈনন্দিন জীবনকে চোখের সামনে জীবন্ত করে তুলে ধরেছে— কোনও আবরণ নেই, বৈচিত্র্য নেই, প্রকৃতি বা প্রেমের রোমান্স নেই। আছে এক কোণে টিম টিম করে প্রদীপের মতো শান্ত পবিত্র হয়ে জ্বলা বুঁচি আর অরুণের মন্দাকিনী প্রেম-যা আমাদের শ্রদ্ধা জাগায়। গজেন্দ্রকুমার তাঁর উপন্যাসগুলিতে (৮১ খানা) প্রেমের যে আস্বাদই দিয়েছেন— তা নিখাদ ত্যাগের প্রেম— যেখানে আবেগের

ঘোরে প্রেমিক প্রেমিকা সংসার ভাঙেননি, প্রতিদ্বন্দ্বীর সঙ্গে ঈর্ষার আগুনে পোড়েননি— নিজে ধূপের মতো পুড়েছেন। ৩৯ বছরে লেখা বা প্রকাশিত (১৯৪৭) 'রাত্রির তপস্যা' যা সিনেমাও হয়েছে, সেখানে নায়ক ভুপেন্দ্র শিক্ষক ও তাঁর ছাত্রী ও মন্ত্রশিষ্য সন্ধ্যা নিজেদের অভিমান মূল্যবোধের সংগ্রামে আলাদা আলাদা ক্ষেত্রে ডুবে আছেন। বুপেন্দ্রর সহিষ্ণুতা, তার শিক্ষকতার কূটকচালি, নিষ্ঠাহীনতার পরিবেশকে শোধরানোর হার না মানা লড়াই ও একটু একটু উত্তরণের আলোর খুশীর শরিক হতে হতে সন্ধ্যা জানেনা কোন্ অগোচরে সে মনপ্রাণ ভুপেন্দ্রকে দিয়ে বসে আছে। সে ভুপেন্দ্রর কাছে কৃতাঞ্জলি হয়ে প্রার্থনা জানায় তাকে যে, নৈতিকভাবে অর্ধাঙ্গিনী ও সহধর্মিনী বলে স্বীকার করুক, তার এই অনাবিল প্রেমের মর্যাদা দিক। ভুপেন্দ্র সামাজিক স্বীকৃতি দিতে পারলোনা— তার স্ত্রী আছে। কিন্তু অকৃত্রিমভাবে সন্ধ্যাকে স্ত্রী বলে স্বীকার করে নিল, কেননা সেও দেখলো সন্ধ্যাকে সেও ভালোবাসে। তাঁর 'প্রাণের মূল্য', 'নতুন ও পুরাতন', গল্পগুলি অন্যস্বাদের প্রেম বুনুনি।

একই রকম প্রেমের জন্য আত্মবলিদানের ও মহান স্বীকৃতির কাহিনী 'দীপ্তি ও দর্পণ' ঐতিহাসিক উপন্যাসে। রূপবান সুপুরুষ যুবা পেশোয়া বাজীরাও বাবার রক্ষিতার কন্যা মস্তিবাঈ বা মস্তানীকে ভালোবেসে ফেলে। পেশোয়ার এদিকে স্ত্রী আছে। মা রাধাবাঈ মস্তানীকে কারাগারে পুরলেন। বাজীরাও মনোকষ্টে রোগজীর্ণ হলেন। রঘুজী নামে এক হৃদয়বান প্রহরী মস্তানীকে জেল থেকে পালাতে দেয়। মস্তানীর খবর নেই। সে বাজীয়াওয়ের পারিবারিক জীবনে অশান্তি ঘটালো না। বাজীরাও অকালেই মারা গেলেন। যখন চিতা জ্বলছে, কোথা থেকে মস্তানী কাঁদতে কাঁদতে সব নিষেধ ভেঙে চিতার কাছে হাজির। তার আকুল আকুতি সে সহমরণে যাবে। তার তো স্বামী এবং জীবনের সর্বস্ব বাজীরাও। তিনি ছাড়া সে অস্তিত্বহীন। সব্বাই সেই বারবণিতাকে টেনে হিঁচড়ে সরাতে যায়। বাধা দিয়ে ওর কাছে এগিয়ে এলেন— ওকে 'ভগ্নী' বলে বুকে জড়িয়ে ধরলেন বাজীরাও পত্নী কাশীবাঈ। 'তুমি স্বামীর প্রকৃত সহধর্মিনী। তোমারই অধিকার সহমরণের।' তাকে সাদরে এগিয়ে নিয়ে গেলেন স্বামীর জ্বলন্ত চিতার কাছে। মস্তানী চিতায় প্রবেশ করলেন। 'রাখাল ও রাজকন্যা' ঐতিহাসিক উপন্যাসে পাঠান মুলুক থেকে পালিয়ে আসা এক কৃষক যুবক আগা মহম্মদের বাহাদুরশাহের জ্ঞাতি নাতনী মেহেরের না পোষমানা ঘোড়াকে ধরে পোষমানানো এবং মেহেরের হারেমের কানুন ও পর্দা ভেঙে বেরিয়ে এসে ঐ বীর কৃষক যুবককে স্বামীত্বে বরণ এবং তার কুঁড়েতে শাকচর্চড়ী ভাত খাওয়ার জীবনকে সানন্দে বরণ করে নেওয়াও এক উজ্জ্বল প্রেমাখ্যান। 'নারী ও নিয়তি' ঐতিহাসিক উপন্যাসে ঔরঙ্গজীব মদ্যপ ও নারী আসক্ত মুরাদকে শৃঙ্খলিত করে কারান্তরালে পাঠিয়েছিলেন। মুরাদ তাঁর কাছে সরস্বতীবাঈ নামে এক নর্তকীকে চেয়েছিলেন। ঔরঙ্গজীব তা মঞ্জুরও করেছিলেন। দেখা গেল মুরাদ ও হিন্দু সরস্বতীবাঈ পরস্পর শরীরে নয় অতলান্তিক প্রেমে আবন্ধ। সরস্বতীবাঈ মনে করতো মুরাদই তার পূর্বজন্মের হিন্দু স্বামী ছিল—এজন্মে যবন হওয়ার সে তাকে পেলনা, তবু মুরাদকে সামনের জন্মে স্বামী হিসাবে পাবেই। এই প্রত্যয় নিয়েই সে অতলান্তিক পরিখায় ঝাঁপ দিয়ে পৃথিবীর থেকে বিদায় নেয়। এজন্মে এটাই তার অনিবার্য নিয়তি। মুরাদেরও তাই। 'বহ্নিবন্যা' ঐতিহাসিক উপন্যাস গজেন্দ্রকুমারকে জনপ্রিয় করে তোলে। সিপাহি বিদ্রোহের কানপুর ও লক্ষ্ণৌ কাণ্ড। তবে বহু চরিত্র। বিদ্রোহ ও যুদ্ধের পশ্চাৎচক্রান্ত ও গতিপথে দেখা গেল দুই বোন আমিনা ও আজিজনের প্রেমের প্রতারণার প্রতিহিংসা নৃশংস চরিতার্থতা বিবিঘরের হত্যাকাণ্ডে বা নাচারগড়ের যুদ্ধক্ষেত্রে প্রকট হয়ে উঠেছে। ইতিহাসে এদের দুই রূপোপজীবীনীর এই বিদ্রোহের চক্রান্তে প্রচ্ছন্ন একটা ভূমিকা ছিলো, যা এ উপন্যাসে গজেনবাবু প্রধান রসাকর্ষণ করে তুলেছেন ইতিহাসকে বিকৃত না করে—মূল উপাদানগুলি অক্ষুন্ন রেখে। এটাই তাঁর শিল্পশৈলী। ঘটনার দৃশ্যগুলির খুঁটিনাটি এত বিশ্বাস্য যে সেগুলো বানানো বলতে অস্বস্তি হয় ঐতিহাসিকদের পক্ষেও।

এই খুঁটিয়ে দেখা ও খুঁটিয়ে বলাই গজেনবাবুর লেখক চরিত্রে উল্লেখ্য বৈশিষ্ট্য। তাঁর কাশী হরিদ্বার ও বৃন্দাবনের গলিঘিঞ্জি, ষাঁড় ও পুরনো বাড়িঘর ও ভেতরমহল হাতের তালুর মতো চেনা ছিল। তাই অত খুঁটিনাটি দৃশ্য দিয়ে তাঁর রহস্যকাহিনী ও ভৌতিক গল্পগুলিতে চোখ আটকে রাখেন। আর খুঁটিয়ে গল্প বলা। কোনও রহস্যধোঁয়া নয়, শুধু ওই খুঁটিনাটি আর জমাটি সংলাপেই তাঁর রহস্য কাহিনী জমে উঠেছে। যেখানে কোনও বন - জঙ্গল, জন্তু-জানোয়ারও নেই। 'প্রারব্ধ' একটি ভয়ঙ্কর আত্মহত্যার রহস্যগল্প। জন্মান্তরবাদে গজেনবাবুর আস্থা ছিলনা— বলেছেন ভানুদা (সবিতেন্দ্রনাথ রায়)। কিন্তু তিনি যেসব অলৌকিক কাহিনী লিখেছেন— তাতে তাঁর পরলোক বা অতীন্দ্রিয়বাদে অবিশ্বাস দেখা যায়নি। 'অন্তহীন যাত্রা' গল্পে সহযাত্রী প্রেতিনী মহিলাটির তাম্বুল চর্বণ করতে করতে গল্প অসাধারণ লাগে। এরকম ভুতের গল্প উল্লেখ্য—'রহস্য', 'এপার ওপার' এবং 'মরণের পরেও'।

অলৌকিক ক্রিয়াকালাপের গল্প—'সাধু ও সাধক', 'নিশির ডাক, 'সময়ের বৃন্ত হতে খসা'। তৃতীয় গল্পটিকে গজেনবাবুর অন্যতম সেরা লেখা বলা যেতে পারে। এগুলির প্রধান চরিত্র সর্বত্যাগী সাধু, সন্ত, মহাত্মারা। এগুলি কল্পনাশ্রিত হলেও লেখকের বলার ধরণে পরিষ্কার তিনি ঐসব বক্তব্যে প্রচণ্ড প্রত্যয়ী। আবার উল্টোটাও। পাঠকের মনে লেখকের সম্বন্ধে ওই ধারণাটা বুনে দেয়াটাও লেখকের অনন্য শিল্পদক্ষতার প্রমাণ।

লেখকের কাশীবাসের খুঁটিনাটি ঘটনা ও বর্ণনার আলেখ্য 'তবু মনে রেখো' উপন্যাসটি। বৃন্দাবনের পটভূমিতে লেখা দুটি অসাধারণ উপন্যাস—'আমি কান পেতে রই' ও জীবনের শেষ পর্যায় লেখা 'রাই জাগো রাই'। এ দুটি উপন্যাস থেকে একটা প্রশ্নই উঠে আসছে—মানুষ কী নিয়ে বাঁচে? ভাবভালবাসা? না অন্য কিছু? প্রশ্নটা লীলা মজুমদারের। 'কান পেতে রই' প্রৌঢ় হয়েই লেখা। এখানে এক অনাথকে মানুষ করেন কর্তাভজা সম্প্রদায়ের নিস্তারিনী। সে রূপসী, গানের গলা ভালো। কিন্তু জাতকুলহীন বলে বিয়ে দিতে পারলেন না। সুরবালা ক্রমে ভাল কীর্তনীয় হয়ে গেল। এক প্রৌঢ় জমিদারকে ভালোবাসল। তার রক্ষিতা হয়ে আলাদা বাড়িতে থাকল। জমিদার মারা গেলেন। সুরবালা তখন সবার চোখের কাঁটা। রোজগারও নেই। সে কলকাতার পাট চুকিয়ে বেচেবুচে চলে গেল বৃন্দাবনে। সেখানে কৃষ্ণ ভাই গণেশের বন্ধু কিরণ— যে বউ ছেলেমেয়ে ছেড়ে সুরবালার সঙ্গী হয়েছে একটা ইচ্ছেয় -সুরবালা তাকে জীবন সঙ্গী করে নিক। সুরবালা জানে কিরণ ছাড়া তাকে দেখার কেউ নেই— সেই মানুষটি সব ছেড়ে মাথায় কলঙ্ক নিয়ে সুরবালার কাছে পড়ে আছে-তার প্রেমের শেষ স্বীকৃতি পেতে। সুরবালার মানসিক নিঃস্বতা একাকীত্বের খরাতেও হাতের কাছে এঘড়া থেকে সে জল উপুড় করে খেতে অস্বস্তিতে। কিরণের বউয়ের

কাছে কী জবাব দেবে? নিজেই সে বাঁচবেই বা কী নিয়ে? জানেনা। জবাব পায়না কিছু না পাওয়া সুরবালা।

'রাই জাগো রাই জাগো'তেও বৃন্দাবনের অন্তর্জীবন, বহির্জীবনের নিবিড় সংলাপ আছে। এটা ১৯৮০ নাগাদ তার শেষ বড়ো লেখা। এখানকার এক বর্ধিষ্ণু প্রাচীন নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব পরিবারের বউ বিশাখা। সবার ভালোবাসা আদর সে নিয়মমতো পায় সবার সেবায়। স্বামী ভদ্র ও তার অনুরাগী। কিন্তু বিশাখার এই বাঁধাবন্ধ জীবন ও ভালোবাসায় মন ভরেনা। সে বাড়ির রীতি রেওয়াজ ভেঙে অন্যপথে গেল প্রেমের উষ্ণ হাতছানি পেয়ে। নানা ঘুর্ণিতে আছড়ে পড়ে, ছড়িকেটে কাঁটা ছেঁড়া নিয়ে সে ফিরতে চাইল স্বামীর নির্মল অনুরাগে। অনেক জল খেয়ে প্রায়শ্চিত্তের পথে পুড়ে পুড়ে সে সেই ডাঙায় স্থান পেল। বুঝলো বৈষ্ণবীর প্রকৃত প্রেম স্বামীর কাছেই—ওখান থেকেই গোবিন্দের প্রেম আসে। এ হলো গজেনবাবুর সারা জীবনের বহুদর্শী পরিক্রমার শেষ অনুভব—প্রেম হয়।

এই জীবন চার অঙ্কের আযৌবন চারণের জীবন। এই জীবনটা ধরা আছে তাঁর ছদ্ম আত্মজীবনী 'আদি আছে অন্ত নেই' উপন্যাসে। ১৯০৮ -এ ১১ই নভেম্বর উত্তর কলকাতায় জন্ম নিলেন। তিন বছর বয়সে বাবাকে হারান। মা তিন পুত্রকে নিয়ে অসহায়। বাংলাদেশে (তখন পূর্ব পাকিস্তান) জমি জমা ছিলো —সেসব থেকে কাকা জ্যাঠারা মাকে বঞ্চিত করে ৫০ টাকা মাসোহারা দেবেন কড়ারে। মা আর মামলা মোকদ্দমার ঝামেলায় গেলেননা। ঐ টাকায় কি কলকাতায় খরচা চলে? কাশীতে খরচা কম। ওখানে গেলেন। কাশীও কি নিরাপদ এক সদ্য যৌবনোত্তীর্ণা মহিলার পক্ষে যদি তিনি দর্শনীয়া হন? পিঠের এক ঢাল চুল মুড়িয়ে কেটে ফেললেন। মার ওই মোড়ানো মাথা থেকে ছোট্ট গজেন হাউমাউ করে কেঁদেছিলেন। গজেনের দুই দাদা অ্যাংলিকান চার্চ স্কুলে, আর গজেন কাশীর সেন্ট্রাল ইন্সিটিটিউশানে ভর্তি হলেন। প্রচণ্ড অভাব। তার মধ্যেই কলতাতার মানসী, বঙ্গবাণী, প্রবাসী পত্রিকা যেত। স্কুল লাইরেরী থেকে বঙ্কিমচন্দ্র, শরৎচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথের গল্প উপন্যাস সুকুমার রায়, যোগীন সরকার, উপেন্দ্রকিশোর এনে পড়তেন। মা বাবা দাদারা এসব বই পড়তে বাধা দিতেন না। মেজদা ডিকেন্স, অসকার ওয়াইল্ড, মোপাশার গল্পের বই লাইব্রেরী থেকে এনে দিতেন। স্কুলের মাইনে নেয়ার দিনে ক্লাসটিচার মাইনে নিতে যখন ব্যস্ত থাকতেন, তখন গজেনকে দিয়ে গল্প বলিয়ে ক্লাস চুপ রাখতেন। অন্য ক্লাসেও মাষ্টারমশাইরা গল্প বলার জন্য গজেনকে নিয়ে যেতেন। সেসব গল্প যে অন্য লেখকদেরই নির্ভেজাল সংস্করণ হতো— তা নয়। তাতে গজেনের নিজস্ব ভেজালও মিশত, কিন্তু তা এমন নিখুঁত হোত - কারও ধরার সাধ্য ছিলোনা। তারজন্য শিক্ষকরা গজেনের বানানোর ক্ষমতার তারিফই করতেন। (সুমথনাথ ঘোষের লেখা)। এই কাশীর বাড়িতে কনিষ্ঠ গজেন ছিলেন মার ন্যাওটা। মার সঙ্গে যখন পড়শীরা তাদের নানান কেচ্ছা ও টানাপোড়েনের কথা বলতেন, গজেন সেগুলো গিলতেন। নিম্নবিত্ত ভদ্রপরিবারের সেই সব জীবনকাহিনি এসেছে তাঁর 'তবু মনে রেখো' উপন্যাসে যা প্রথম ধারাবাহিক বের হয় দেশ পত্রিকায়। 'কলকাতার কাছেই' যা সাহিত্য একাডেমী'র পুরস্কার পেলো- তারও গোড়ার দিকের মা রাসমণি, উমা, শ্যামা, কমলার জীবন, তাদের স্বামীদের ল্যাম্পট্য, অত্যাচার, দায়হীনতার কাহিনীর মালমশলা গজেনের মা ও পড়শীদের গল্পালাপ থেকে সংগৃহীত। এই গল্পলাপ কাশী থেকে শুরু হয়ে পরে কাশীর পাট চুকিয়ে মেজদার বি এসসি পড়ার ব্যবস্থা করতে ওঁদের কলকাতায় আসতে হয় নারকেলডাঙার ভাড়া বাসায়, সেখান বছর খানের কাটিয়ে হাওড়ার আন্দুলে আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে কাটানো—সেই তিনবছরের বস্তির জীবননামচার গল্পসল্প ও দেখা ক্লেদাক্ত জীবনও আছে— 'কলকাতার কাছেই' 'উপকন্ঠে' ও 'পৌষফাগুনের পালা' ত্রয়ী উপন্যাসের ক্যানভাসে। মেজদা গ্র্যাজুয়েট হয়ে সরকারী চাকরি পান। বড়দা আরবে পল্টনের ডাক পেয়ে স্কুলের পাট না চুকিয়েই পাড়ি দেন। ১৯২৮ সালে মেজদা টাকা জমিয়ে ৫০০০ টাকায় ঢাকুরিয়া স্টেশনের পূবপাড়ে নারকেল গাছওয়ালা, সামনে পুকুরওয়ালা অর্ধসমাপ্ত দোতলা বাড়ি কেনেন। ২১/বি, বেনী ব্যানার্জ্জী স্ট্রীটে। একটি এখন একটি পূর্ণাঙ্গ দোতলা বাড়ি। সামনের পুকুরটিও এখন ঢাকুরিয়া সুইমিং পুল নামে সুসজ্জিত। গজেনবাবু নিঃসন্তান ছিলেন। এ বাড়িতে এখন থাকেন তাঁরই পালিত সবিতেন্দ্রনাথ রায়— 'মিত্র ঘোষ' পাবলিশার্সের' অন্যতম কর্ণধার সপরিবারে। এসব কথা তাঁর মুখেই শোনা। ঢাকুরিয়ায় এসে গজেন ভর্তি হন ক্লাস এইটে জগবন্ধ উন্সটিটিউশনে, বালীগঞ্জে। সেখানেই সহপাঠী ও আজীবন জীবন ও জীবিকার অভিন্নহৃদয় বন্ধু হিসাবে পান লেখক সুমথনাথ ঘোষকে। স্কুলে দেওয়াল পত্রিকায় গল্প লিখতেন। ম্যাট্রিক ফার্স্ট ডিভিশনে পাশ করে সেন্ট ডেভিয়ার্সে আই এফ সি (উচ্চ মাধ্যমিক) তে ভর্তি হলেন। সাহিত্যের নেশা ও রোজগারের ধান্দায় কলেজ ছাড়লেন দুই বন্ধুই। গজেনবাবু টিউশানি করতে লাগলেন।

এসময়েই তাঁর লেখা 'ঋত্বিক' পত্রিকার সম্পাদক কেশব সেন 'শেফালী' পত্রিকায় প্রথম ছেপে বের করলেন। বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় আনন্দবাজারের একটি বিশেষ সংখ্যায় তাঁর লেখা ছাপলেন। প্রথম দক্ষিণা পেলেন লেখার জন্য ৭ টাকা। এরপর বাণীমন্দির তাঁর প্রথম বড়োগল্পের বই 'রক্তলেখা' ছেপে বের করে। এটি মোপাঁশার একটি গল্পের অনুবাদ। ঋত্বিক পত্রিকার কেশব সেনের পরামর্শে ও পৃষ্ঠপোষণায় দুই বন্ধু প্রকাশকদের কাছ থেকে ব্যাগ ভর্তি পাঠ্য বই নিয়ে কলকাতার উপকণ্ঠে এবং কাছের জেলাগুলিতে হাওড়া, হুগলী, বর্ধমান এপাশে বনগাঁ পর্যন্ত ট্রেনে বাসে গিয়ে স্কুলগুলিতে ক্যানভাসিং করতে লাগলেন। ৪/৫ বছরের এই পরিক্রমার জীবনে ঐসব মফঃস্বলের শহরের এবং উপকণ্ঠের মানুষজনের সঙ্গে চায়ের ঠেক ও দোকানপাটে প্রান্তিক ভদ্র সমাজের কষ্টক্লিষ্ট নানা শ্রেণীর মানুষের জীবনগাথা ও চোরাস্রোতের সঙ্গে নিবিড়ভাবে পরিচিত হলেন। 'উপকণ্ঠ' ও 'পৌষ পাল্গুনের পালা'য় এইসব টানাপোড়েনের অবক্ষয়ী জীবনের প্রতিফলন এসেছে। এবাদেও তাঁর গল্প উপন্যাসে এই অঞ্চলের নিম্নবিত্ত ভদ্রসমাজের মানুষেরাই এসেছেন তাঁদের জীবনের খুঁটিনাটি নিয়ে। বস্তী অঞ্চলের মা মেয়েদের মেয়েলী গেঁয়ো ভাষা এসেছে মাটি ও নালার গন্ধ নিয়ে অকৃত্রিম প্রবাহে। এদের জীবনে প্রেমের রোমান্স নেই। গজেনবাবু জীবনকে এত কঠিন বাস্তবভাবে ছোটবেলার থেকে দেখেছেন নিম্নবিত্তের কায়ক্লিষ্ট মানুষের সমাজে— যার জন্যে তাঁর গল্পে, উপন্যাসে শরৎচন্দ্রের আবেগ নেই। বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে থেকে প্রচণ্ড প্রকৃতিপ্রেমী, কিন্তু গল্প উপন্যাসে প্রকৃতির রোম্যান্টিসিজম্ বা প্রেমের আবেগ নেই। একমাত্র ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলি যেগুলি কল্পরসে সমঋদ্ধ, সেগুলি ছাড়া, বাস্তব জীবনকথার গল্পে, উপন্যাসে মানিকের ফ্রয়েডীয় প্যাশন, বা প্রেমের প্যাশনের খেলা খেলেনইনি। তাঁর প্রেমের গল্প অনেক সময় পড়া শেষ হলেও বোঝা যায়না সেটা প্রেমের গল্প কিনা। আর যদিও হয়, তা আপনার মনকে জ্বালিয়ে বিষাক্ত করারই সম্ভাবনা।

সেইজন্যে একজন লেখক গজেনবাবু জীবনে প্রেম করেছেন কিনা জানতে চাইলে—বলেন — হয়েছিলো, কিন্তু এগোতে পারিনি—তাদের বিয়ে হয়ে গিয়েছে। অর্থাৎ কোনো নিষিদ্ধ প্রেমের ফ্যাসাদে তিনি নেই।

গজেনবাবু, সুমথবাবু ও প্রফুল্লবাবু মিলে ঠিক করলেন নিজেরাই একটা পাবলিশিং কোম্পানী করবেন—সেখান থেকে বইপত্র বেরোবে, সাহিত্যিকদের মজলিশ হবে এবং তাঁদের সাহিত্য চর্চাও সমৃদ্ধ হবে। স্থাপিত হলো মিত্র ঘোষ পাবলিশার্স লিমিটেড—৭-১০ খানা ঘরের বাড়ি নিয়ে ১০নং শ্যামাচরণ দে স্ট্রীটে ১৯৩৪ সালে। জানা গেল, এই বাড়িতেই প্রথম কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ শুরু হয়। পরে পাশের গলিতে ৮৪এ, হ্যারিসন রোডে (মহাত্মা গান্ধী রোড) এখানেও ডাঃ বিধান রায় চেম্বার করেছিলেন (সূত্র-মনীশ চক্রবর্তী - মিত্র ঘোষ) আরও দুখানি ঘর সংযোজিত হলো। প্রথম দিকে শ্যামাচরণ দে স্ট্রীটের ঘরে ও পরে সব সাহিত্যিকদের নিয়মিত আড্ডা জমত হ্যারিসন রোডের ঘরে।

ডঃ সুনীতি চট্টোপাধ্যায়, প্রমথনাথ বিশী, ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, কালিদাস রায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, নৃতত্ত্ববিদ নির্মল বসু, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, (যখন ব্যারাকপুরে থাকতেন) তারাশংকর, সজনীকান্ত দাস, হরিনারায়ন চট্টোপাধ্যায়, রাণী রায় প্রমুখ নানান দিকপাল ('কলেজস্ট্রীটের সত্তর বছর', সবিতেন্দ্রনাথ রায়, মনীশ চক্রবর্তী, প্রদোষ পাল ছিলেন গজেনবাবু, সুমথবাবুর দক্ষিণহস্ত এবং এই আড্ডার হুকুমপালক। এঁরা সব গজেনবাবুকে কাকাবাবু ডাকতেন এবং গজেনবাবুর পরিবারের লোক হয়ে গিয়েছিলেন। এঁদের সহৃদয় ব্যবহারেই এবং গজেনবাবুর গল্পরসে সাহিত্যিক ও পণ্ডিতরা এখানে আসার আকর্ষণ বোধ করতেন। ওঁরা এলেই মুড়িচানাচুর চলে আসত। গজেনবাবুর অগাধ পড়াশুনা ও তথ্য এবং রসসিক্ত গল্পের স্বাদ পাওয়ার জন্যে বহু ভক্ত এখানে জমতেন। প্রচণ্ড হৃদয়বান ব্যক্তি ছিলেন গজেনবাবু—সাহিত্যিকদের বই লেখার বিষয় ও ছাপানোর নতুন নতুন আইডিয়া দিতেন। তাঁদের বই মিত্র-ঘোষের বাইরের প্রকাশনী থেকেও ছাপার ব্যবস্থা করে দিতেন।

১৯৪৪ -এ বিয়ে করলেন বেথুনের গ্র্যাজুয়েট সুদর্শনা স্নেহশীলা প্রতিমাদেবীকে। তাঁর গুণপনার সুখ্যাতি অন্নদাশংকর রায়, আশাপূর্ণাদেবী, নবনীতা দেবসেন প্রমুখ অনেকেই করেছেন। ভানুবাবুরা (সবিতেন্দ্রনাথ রায়) ওঁর কাছেই ঢাকুরিয়ার বাড়িতে বাড়িতে পড়া করতেন। একদিন ওঁরা পড়েছেন। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় পাশে ইজিচেয়ারে শুয়ে। পড়ুয়া একজন বললো—তাদের প্রশ্ন এসেছে— 'পথের পাঁচালী'র মূল সূত্র কী? প্রতিমাদেবী বললেন—এই তো পথের পাঁচালীর মালিক বসে আছেন— জিজ্ঞাসা করো। বিভূতিবাবু খিঁচিয়ে উঠলেন—'পথের পাঁচালী' মূলসূত্র! সে আবার কি? লিখে দে—মলসূত্র।' (সবিতেন্দ্র নাথ রায়)। প্রচণ্ড বেড়াতে ভালোবাসতেন। পুরী আর ঘাটশিলা প্রায়ই পাড়ি দিতেন। বিভূতিবাবুর তাগাদায় ঘাটশিলায় একটা বাড়িও কিনেছিলেন। বিভূতিবাবু মারা গেলে সেটা বিক্রী করে দেন। বিভূতিবাবুকে প্রচণ্ড শ্রদ্ধা করতেন— ভীষণ ঘনিষ্ট ছিলেন পারিবারিকভাবে।

ডাকতেন বড়দা বলে। তাঁর মৃত্যুকালে সুমথবাবু ছিলেন ঘাটশিলায়। গজেনবাবু হরিদ্বারে ছিলেন। ওঁকে শেষ দেখা দেখতে পারেননি বলে ভীষণ দুঃখ ছিল ওঁর। গজেনবাবু ন্যাটা ছিলেন এবং চিঠি লিখতেন সংক্ষিপ্ততম ভাষায় এবং নীচে 'গজেন' না লিখে 'গ' লিখতেন। রসিক সাহিত্যিকরাও তাঁকে ঐ আখ্যায় 'গ' বলে চিঠি দিতেন।

এই গল্পপ্রাণ লোকটি ২০০০এর ওপর গল্প লিখেছিলেন। তাঁর ছোটগল্প এখনকার স্টাইলের প্লটহীন গল্প নয়। তাঁর বক্তব্য ছিল—প্লট ছাড়া গল্প হয় নাকি? গল্পে অহেতুক মেদ বা বর্ণনা থাকেনা, প্রকৃতি থাকেনা, আবেগ বা সেন্টিমেন্টের ফেনা নেই, বাস্তব চিত্রের প্রবাহ বেগবান নয়, মন্দাক্রান্তা। স্টান্ট নেই, আবেশ আছে, রহস্য আছে, কষ্ট আছে ৭০ দশকের শেষভাবে লেখা একেবারে অন্য গজেন্দ্রকুমার 'পাঞ্চজন্য' উপহার দিয়ে বাঙালি পাঠক সমাজের মুকুটমনি হয়ে গেলেন। বলেনা! ওস্তাদের মার শেষরাত্রে! এও তাই। মহাভারত গুলে খেয়ে তাঁর ভেতর ছেঁকে রক্ত মাংসের শ্রীকৃষ্ণকে আমাদের মনের কোঠায় মেলে ধরলেন তাঁর মানবধর্মের শ্রেষ্ঠ গুণসমন্বয়ে ও উত্তরণে—পুরুষোত্তম করে। পৌরাণিক ক্লাসিক। তাই ভাষাও অগজেন্দ্রীয়—নাদকণ্ঠ।

এই সুদেহী, সুরসিক, হৃদয়বান মানুষটি ৮৬ বছর বয়েসে ডায়াবেটিক কোমায় ১৯৮৪ সালের ১৬ই অক্টোবর কলকাতায় কোঠারী হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন—

তথ্যসূত্র ঃ—

গজেন্দ্রকুমার মিত্র-জন্মশতবর্ষ সংখ্যা, কলেজস্ট্রীটের ৭০ বছর, সবিতেন্দ্রনাথ রায়, মনীশ চক্রবর্তী ও গ্রন্থাবলী।